Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501096 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Rabindranath's Thought and Philosophy regarding Death Consciousness in Upanishads
রবীন্দ্র মননে ও দর্শনে ঔপনিষদিক মৃত্যু চেতনা

Debashrita Das
Silver medal-winning Bharatanatyam dancer and essayist
Amta, Howrah

Received on: 30th April 2026
Accepted on: 14th May 2026

Abstract:
This research paper is written on Rabindranath Tagore's philosophy of death and its similarities with the Upanishadic concept of death.

Key Words:
Rabindranath Tagore, Philosophy of death, Upanishadic thought, Death consciousness, Spiritual philosophy

মূল প্রবন্ধ

"যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে
আমি বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে গো
যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে।"

সাধারণ মানুষের কাছে মৃত্যুর স্বরূপ সম্পর্কিত কোনো স্পষ্ট ধারণা থাকে না। মৃত্যু কি জ্যোতির্ময় নাকি অন্ধকারের রূপ? সাধারণের কাছে তা চির দুর্বোধ্য চির অগম্য। তবুও চিন্তায় চেতনায় মৃত্যু সম্পর্কিত ভাবনার একটি বিশিষ্ট স্থান চিরস্থায়ী। কেমন এই মৃত্যু? কেমন মৃত্যুপারের জগৎ? মহিমাময়? তাকে কি ধরা ছোঁয়া যায়? কিন্তু কবির কাছে একদা যা ছিল বাইরে তার স্থান হয় অন্তরে। যা ছিল সকলের — সমব্যাথার স্তর পার হয়ে তা হয়ে ওঠে কেবলই নিজের ও একার। কবির কাব্যই তাঁর ভাব জীবনের পরিচয় বহন করে এবং অনেক সময় ব্যক্তি জীবনেরও। মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয় রবীন্দ্রনাথের ছোটোবেলা থেকেই। মায়ের মৃত্যু দিয়ে — সে এক বোঝা না বোঝার পালা। তারপরে তো কত প্রিয়জনের চলে যাওয়া, বুকের কাছের কত স্নেহ প্রদীপের নিভে যাওয়া। তবে তখন কবির কাছে জীবনের সঙ্গে জীবনান্তের বিচ্ছেদ বোঝা তেমন কঠিন ছিল না। 'জীবনস্মৃতি'তে 'মৃত্যুশোক' তিনি এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন —

"শিশু বয়সের লঘু জীবন বড় বড় মৃত্যুকেও অনায়াসেই পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যায়,
কিন্তু অধিক বয়সে মৃত্যুকে অত সহজে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিবার পথ নাই।
তাই সেদিনকার সমস্ত দুঃসহ আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইয়া ছিল।"

মানবজীবনের অত্যন্ত মৌলিক তথা গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হলো মৃত্যু। মানুষ বাদে অন্যকোনো প্রাণী মৃত্যু নিয়ে ভেবেছে এমন নজীর নেই। মৃত্যুকে ঘিরে গড়ে উঠেছে কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম এমনকি বিজ্ঞানও। মৃত্যু স্থান-কাল ভেদে সব মানুষকে ভাবায় এবং সত্যিকারার্থে পৃথিবীতে এমন মানুষ পাওয়া ভার, যার মৃত্যু নিয়ে ভাবনা নেই। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (জন্ম ১৮৬১ সালে ২৫শে

© Santiniketan Sahityapath

বৈশাখ — মৃত্যু ১৯৪১ সালে ২২শে শ্রাবণ) কাব্যিক এমনকি দার্শনিক ঢঙে সমগ্র জীবনব্যাপী মানবজীবনের নানাদিক নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছেন এবং সাহিত্যের নানা আঙ্গিকে তা প্রকাশও করছেন। তার মধ্যে অন্যতম তাঁর মৃত্যু চেতনা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে মৃত্যু একটি গভীর ও পুনরাবৃত্ত বিষয়, যা তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা ও দার্শনিক চিন্তা থেকে উদ্ভূত। আমার এই গবেষণা প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু চেতনা সম্পর্কিত আর মৃত্যু নিয়ে তাঁর যে গভীর ভাবনা তা এই প্রবন্ধে প্রতিটি পরতে বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্র ব্যক্তি জীবনে মৃত্যু ও মননে তার প্রতিফলন:

মৃত্যুর করাল ছায়া কবির সুদীর্ঘ জীবনে বারবার আঘাত হেনেছে। শোক যেন তাঁর নিত্য সহচর। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে মায়ের মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের মনে প্রথম শোকের ছবি এঁকেছিল, তারপর অসংখ্য পারিবারিক মৃত্যু ঢেউয়ের মত তাঁর জীবনে আছড়ে পড়েছে। প্রথম যৌবনে মৃত্যুর আঘাতগুলিতে তিনি উদ্ভ্রান্ত, অস্থির হয়ে উঠতেন, তাঁর জীবন হয়ে যেত এলোমেলো দিশাহীন। জীবনকে আটকে রাখা যাবে না, এই পরম সত্য উপলব্ধির পর তিনি মৃত্যুকে শান্ত চিত্তে গ্রহণ করতে শিখেছিলেন। তাই জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন —

> "জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য
> যে দূরত্ব প্রয়োজন, মৃত্যু দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল।
> আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার ওপর
> সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম, তাহা বড়ো মনোহর।"

এই নির্লিপ্ততার কারণেই রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পেরেছেন। শোকের বহিঃপ্রকাশ না থাকলেও প্রতিটি মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর প্রভাব পড়ত। মৃত্যু নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে ভেবেছেন এবং সাহিত্যের নানা আঙ্গিকে তা প্রকাশও করেছেন। শোকের আঘাত কবির সৃষ্টিকে দিয়েছে নতুন মহিমা, শিখিয়েছে মৃত্যুঞ্জয় হওয়ার মন্ত্র। তাই তো তিনি বলেছেন —

> "দুখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে,
> যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করিয়া ধরিব হে।"

রবীন্দ্রনাথে ছিলেন দীর্ঘ জীবনের অধিকারী। অনিবার্যভাবে পারিবারিক মৃত্যু — আঘাত তাঁকেই সবচেয়ে বেশি সহ্য করতে হয়েছিল।

- ভ্রাতা বুধেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু (১৮৬৩-১৮৬৪)

  রবীন্দ্রনাথকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণিষ্ঠ পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জন্মের (১৮৬১) দু'বছর পরে (১৮৬৩) দেবেন্দ্রনাথের আর একটি পুত্র সন্তান জন্মেছিল। তার নাম বুধেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তা জানা যায় লণ্ডন থেকে লেখা পত্নী জ্ঞানদানন্দিনীকে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠিতে — "রবির পরে আমার আর এক ভ্রাতা হইয়াছে শুনিলাম, তাহার নাম কি হইয়াছে?" কিন্তু জন্মের এক বছর পরেই তাঁর মৃত্যুর হয়। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র তিন বছর। স্বাভাবিক ভাবেই সেই মৃত্যু—শোকের কোনো ছায়া রবীন্দ্রনাথের শিশু মনে রেখাপাত করতে পারেনি।

- মাতা সারদাসুন্দরী দেবীর মৃত্যু (১৮২৬ - ১০ মার্চ ১৮৭৫)

  বুধেন্দ্রনাথের কোনো স্মৃতি না থাকলেও মাতা সারদা দেবীর মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রথম মৃত্যু শোক। ১৮৭৫ সালের ১০ মার্চ মাসে মাত্র ৪৯ বছর বয়সে, সম্ভবত 'হাতের দূষিত ঘা-জনিত ইনফেকশনে' তাঁর মৃত্যু হয়। হয়ত অস্ত্রোপচারেরও প্রয়োজন হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন ১৪ বছরের বালক। ধীরে ধীরে প্রবেশ করছেন বাংলার সাহিত্য — আঙ্গিনায়। ইতিমধ্যে লিখে ফেলেছেন বেশ কিছু গান-কবিতা-প্রবন্ধ। একটু একটু করে বিকশিত হচ্ছে তাঁর কবিমনের অনুভূতিগুলি। শৈশবের দিনগুলি মধুর স্মৃতিতে ভরিয়ে রেখেছেন নতুন বউঠান কাদম্বরী দেবী। সেই আনন্দিত মুহূর্তে মায়ের মৃত্যু — অভিঘাত তাঁর কিশোর মনে যে আলোড়ন তুলেছিল তা তিনি প্রকাশ করেছেন জীবনস্মৃতিতে — "অনেকদিন হইতে তিনি রোগে ভুগিতে ছিলেন, কখন যে তাঁহার জীবনসংকট উপস্থিত হইয়াছিল তাহা জানিতেও পাই নাই। এতদিন পর্যন্ত যে-ঘরে আমরা শুইতাম সেই ঘরেই স্বতন্ত্র শয্যায় মা শুইতেন। কিন্তু তাঁহার রোগের সময় একবার কিছুদিন তাঁহাকে বোটে করিয়া গঙ্গায় বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হয় তাহার পরে বাড়িতে ফিরিয়া তিনি অন্তঃপুরের তেতালার ঘরে থাকিতেন। যে-রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হয় আমরা তখন ঘুমাইতেছিলাম, তখন কত রাত্রি জানি না, একজন পুরাতন দাসী আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া

© Santiniketan Sahityapath

কাঁদিয়া উঠিল, 'ওরে তোদের কী সর্বনাশ হলো রে।' তখনি বউঠাকুরানী তাড়াতাড়ি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেলেন — পাছে গভীর রাত্রে আচমকা আমাদের মনে গুরুতর আঘাত লাগে এই আশঙ্কা তাঁহার ছিল। স্তিমিত প্রদীপে, অস্পষ্ট আলোকে ক্ষণকালের জন্য জাগিয়া উঠিয়া হঠাৎ বুকটা দমিয়া গেল, কিন্তু কী হইয়াছে ভালো করিয়া বুঝিতেই পারিলাম না। প্রভাতে উঠিয়া যখন মা'র মৃত্যু সংবাদ শুনিলাম তখনো সে-কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম, তাঁহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপরে শয়ান। কিন্তু মৃত্যু যে ভয়ংকর সে — দেহে তাহার কোনো প্রমাণ ছিল না। সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে-রূপ দেখিলাম তাহা সুখসুপ্তির মতোই প্রশান্ত ও মনোহর।... কেবল যখন তাঁহার দেহ বহন করিয়া বাড়ির সদর দরজার বাহিরে লইয়া গেল এবং আমরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্মশানে চলিলাম তখনই শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে এক-দমকায় আসিয়া মনের ভিতরটাতে এই একটা হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ির এই দরজা দিয়া মা আর একদিনও তাঁহার নিজের এই চিরজীবনের ঘরকন্নার মধ্যে আপনার আসনটিতে আসিয়া বসিবেন না।"

রবীন্দ্রনাথের মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'অভিলাষ' এবং ১৯ বছর বয়সে লেখা 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' কাব্যগ্রন্থের 'মরণ' কবিতাটি তাঁর শোক ও মৃত্যুভাবনাকে প্রকাশ করে। তাঁর জীবনের প্রথম শোক ছিল মায়ের মৃত্যু এবং এই সময়ে তিনি কৈশোরে মাকে হারানোর বেদনা নিয়ে তিনি এই কবিতাটি লিখেছেন —

"মরণ রে, তুঁহু মম শ্যামসমান।
মেঘবরণ তুঝ, মেঘজটাজূট,
রক্তকমলকর, রক্ত-অধরপুট,
তাপবিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু-অমৃত করে দান॥"['ভানুসিংহঠাকুরের পদাবলী', 'মরণ' কবিতা ১২৮৮ বঙ্গাব্দ]

আগমনী পত্রিকায় (১৩২৬) প্রকাশিত গোটা ছয়েক ছোটো ছোটো কবিতা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের রচনায় মায়ের উল্লেখ প্রায় নেই বললেই চলে। এর প্রধান কারণ মায়ের সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনে যোগাযোগের অভাব। কবির শৈশব কেটেছিল ভৃত্যদের অধীনে, মায়ের স্নেহ মমতা কোনোদিনই তেমনভাবে পান নি। উপরন্তু দীর্ঘ অসুস্থতার কারণে বহুদিন মায়ের কাছ থেকে দূরে থাকতে হয়েছিল। এই সময়ে মাতৃহীন বালকটিকে স্নেহ মমতা দিয়ে আগলিয়ে রেখেছিলেন 'বাড়ির কনিষ্ঠা বধূ কাদম্বরী'।

- ভগ্নীপতি সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যু (১৮৩৮-৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩)
  সারদা দেবীর মৃত্যুর আট বছর পরে আবার অঘটন। সেদিন ১৮৮৩ সালে ৯ ডিসেম্বর। রবীন্দ্রনাথের বিয়ের দিন। সাদামাটা বিয়ের অনুষ্ঠানটা ছিল একান্তই অনাড়ম্বর। বাসরঘরের রাতজাগার ক্লান্তি কাটতে না কাটতেই টেলিগ্রাম মারফৎ আসা এক দুঃসংবাদে বিয়েবাড়ির সমস্ত আনন্দ এক নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের দিদি সৌদামিনী দেবীর স্বামী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় মৃত্যু হয়েছে শিলাইদহে। জমিদারির কাজে ব্যস্ত থাকায় তিনি রবির বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে সৌদামনী দেবী কারোয়ার থেকে জোড়াসাঁকোয় ফিরে আসেন। তবে ভগ্নীপতি সারদাপ্রসাদের মৃত্যু-শোক কবির জীবনের বিশেষ প্রভাব ফেলেনি, সেই দুঃখ ছিল নিতান্তই সাময়িক। কারণ সারদাপ্রসাদের মৃত্যুর তিন মাস পরেই হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের বিয়ে (মার্চ ১৮৮৪) উপলক্ষে আয়োজিত বিবাহ উৎসব নাটকের জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রস্তুতি আর ২৮টি গান রচনার ব্যস্ততায় শোকের তাপ ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

- বউঠান কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু (৫ জুলাই ১৮৫৯ - ১৯ এপ্রিল ১৮৮৪)
  রবীন্দ্রনাথের জীবনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী, নতুন বউঠান, কাদম্বরী দেবীর প্রভাব ও অবদান সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলবার অবকাশ নেই। তিনি ছিলেন কবির 'জীবনের ধ্রুবতারা'। কাদম্বরীর আকস্মিক আত্মহত্যা রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ উদ্ভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। দিনটা ১৯ এপ্রিল ১৮৮৪, রবীন্দ্রনাথের বিয়ের মাত্র চার মাস পরের ঘটনা। বাড়ির এক কর্মচারিকে দিয়ে

সংগ্রহ করা আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করলেন দেবেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী। ঝড় বয়ে গেল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির উপর দিয়ে। কেন তিনি আত্মহত্যা করলেন ? মনে করা হয় স্বামী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অবহেলা, তাঁর অন্য-মহিলা প্রীতি, একাকীত্ব, পরিবারের অন্য মহিলাদের কুৎসা ইত্যাদি মানসিক জটিলতাই তাঁকে এই কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছিল। সামাজিক দুর্নামের ভয়ে মহর্ষি সেদিন তাঁর প্রভাব খাটিয়ে পুত্রবধূর পোস্টমর্টেম-সহ অন্যান্য পুলিশি ঝামেলা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন। শুধু তাইই নয় কাদম্বরীর চিঠিপত্র সমেত যাবতীয় নথিপত্র পুড়িয়ে ফেলে তাঁর স্মৃতি ঠাকুরবাড়ি থেকে চিরতরে মুছে ফেলার চেষ্টাও করা হয়েছিল।

কাদম্বরীর মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের মনোজগতের যে আলোড়ন তুলেছিল তার ব্যাপ্তি সীমাহীন। সবচেয়ে প্রিয়জনের চিরবিচ্ছেদ তিনি মেনে নিতে পারেন নি। প্রায় সারাজীবন বিভিন্ন ভাবে এই শোককে তিনি স্মরণ করেছেন তাঁর সৃষ্টিতে তাঁর গানে, কবিতায়, নানাজনের সঙ্গো কথোপকথনে। মায়ের মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের বালক মনে তেমন ছায়াপাত করেনি। কিন্তু কাদম্বরীর যন্ত্রণাকাতর মৃত্যু হয়েছিল তাঁর চোখের সামনে। সেই মৃত্যু-অভিঘাতের তীব্রতা তাঁর অন্তরাত্মাকে একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। এই যন্ত্রণা থেকে তিনি জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, “ইতিপূর্বে মৃত্যুকে আমি কোনোদিন প্রত্যক্ষ করি নাই।... কিন্তু আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গো যে-পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদ শোকের সঙ্গো মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে। শিশুবয়সের লঘু জীবন বড়ো বড়ো মৃত্যুকেও অনায়াসেই পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যায় কিন্তু অধিক বয়সে মৃত্যুকে অত সহজে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিবার পথ নাই। তাই সেদিনকার সমস্ত দুঃসহ আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইয়াছিল।”

কাদম্বরীর মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথের জীবনে কেটেছে বহু বিনিদ্র রাত। গভীররাত পর্যন্ত তেতলার ছাদে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে নির্নিমেশে তাকিয়ে থেকেছেন, এক অলীক আশা নিয়ে — যদি বউঠান একবার এসে দেখা দেন। সে সময়ে তাঁর বেশবাস খাওয়াদাওয়ার কোনো ঠিক ঠিকানা ছিলনা। সেসময় তিনি এক কঠিন কৃচ্ছসাধনায় নিজেকে দগ্ধ করেছেন প্রতিদিন। কাদম্বরীর মৃত্যুর পরে তাঁকে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য গান, কবিতা, স্মৃতিকথা লিখেছেন। সবচেয়ে বেশি কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন নতুন বউঠানকেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চব্বিশ বছর বয়স থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বহন করে গিয়েছেন সেই শোক-বেদনা।

- ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু (৬ নভেম্বর ১৮৭০ — ১৯ অগস্ট ১৮৯৯)

  বীরেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র বলেন্দ্রনাথের জন্মের সময়ে কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। সম্পর্কে ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন। বলেন্দ্রনাথ ‘ঠাকুর এন্ড কার কোম্পানীর’ অন্যতম অংশীদার ছিলেন। এছাড়া ‘বালক’ পত্রিকার সম্পাদনা, ব্রাহ্মসমাজের নানা দায়িত্ব পালন ইত্যাদির পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তায় দুর্বল স্বাস্থ্য বলেন্দ্রনাথ ক্রমেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। একবার শিলাইদহে হিসাবপত্র সামলানোর কাজে এতই ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল যে নাওয়া খাওয়ার সময় ছিল না। সেই অনিয়ম আর অত্যাচারে কানের যন্ত্রণা বেড়ে গিয়ে জ্বরের কবলে পড়েন। স্থানীয় চিকিৎসায় কাজ না হওয়ায় তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। সে সময় রথীন্দ্রনাথও অসুস্থ ছিলেন। দুজনেরই রোগ পরিচর্যার দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। বহু ডাক্তারের সম্মিলিত চিকিৎসা সত্বেও বলেন্দ্রনাথের শারীরিক অবস্থার ক্রমেই অবনতি হতে লাগল, জ্বরের সঙ্গো দেখা দিল নানা উপসর্গ। অবশেষে সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে ১৮৯৯ সালের ১৯ অগস্ট মাত্র ২৯ বছর বয়সে বলেন্দ্রনাথ অমৃতলোকে পাড়ি দিলেন। বলেন্দ্রনাথের মা প্রফুল্লময়ী দেবী তাঁর ছেলের মৃত্যু — বর্ণনায় লিখেছেন, “যেদিন সে জন্মের মত আমাকে তাহার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া চলিয়া গেল, সেইদিন রবি (আমার ছোটো দেওর) আসিয়া আমাকে বলিলেন তুমি একবার তার কাছে যাও, সে তোমাকে মা মা করিয়া ডাকিতেছে। আমি এক এক সময় তাহার যন্ত্রণা দেখিতে না পারিয়া পাশের ঘরে গিয়া বসিয়া থাকিতাম। রবির কথা শুনিয়া যখন তার কাছে গিয়া তার পাশে বসিলাম তখন তার সব শেষ হইয়া আসিয়াছে। মনে হইল আমাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল, তাহার পর একবার বমি করিয়া সব শেষ হইয়া গেল। তখন ভোর হইয়াছে। সূর্যদেব ধীরে ধীরে তাঁহার কিরণচ্ছটায় পৃথিবীকে সজীব করিয়া তুলিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় তাহার দীপ নিভিয়া গেল।” বলেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল।

- ভ্রাতুষ্পুত্র নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু (১ ডিসেম্বর ১৮৬৭ — ১২ সেপ্টেম্বর ১৯০১)

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ পুত্র নীতিন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র, ডাকনাম নিতু। ঠাকুরবাড়ির গৃহসজ্জা, বিভিন্ন নাটকের মঞ্চসজ্জা, শিলাইদহের কুঠিবাড়ি পরিকল্পনা ইত্যাদিতে তাঁর কৃতিত্বের ছাপ রয়েছে। ১৯০০ সালের মাঝামাঝি তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সম্ভবত তিনি 'লিভার সিরোসিস' রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এই খবর শুনে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহের জরুরি কাজ ফেলে কলকাতায় ছুটে এসে দিনরাত রোগীর শিয়রে বসে সেবাশুশ্রূষা করেছেন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের নাওয়া খাওয়া, নিজের দিকে তাকানোর কোনো ঠিকঠিকানা ছিল না। কিছুদিন পরে নীতীন্দ্রনাথ একটু সুস্থ হলে বিলেতে জগদীশচন্দ্রকে লিখলেন, "আমার একটি ভ্রাতুস্পুত্র সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত বলিয়া আমি কলিকাতায় আসিয়াছি। প্রায় আট রাত্রি ঘুমাইতে অবসর পাই নাই তাই আজ মাথার ঠিক নাই শরীর অবসন্ন। কাল হইতে তাহার বিপদ কাটিয়াছে বলিয়া আশ্বাস পাইয়াছি। এখন নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সময় আসিয়াছে মনে করিয়াছি দুই-চারি দিন বোলপুর শান্তিনিকেতনে যাইব।" সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী দেবী শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ছাত্রদের হোস্টেল, শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি কাজে প্রচণ্ড ব্যস্ত। নিদারুণ অর্থাভাবের জন্য মৃণালিনী একটি একটি করে নিজের গয়না বিক্রি করে দিচ্ছেন। তারই মাঝে নীতীন্দ্রনাথের অসুখ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগের অন্ত নেই। ১৯০১ সালে অগস্ট মাসে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হলো। খ্যাতনামা চিকিৎসকরা একযোগে অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি আর কবিরাজি চিকিৎসা, এমনকি শরীরে অস্ত্রোপচার করেও শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। ১৯০১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর রাত দুটোর সময় ঈশ্বর তাঁকে অনন্তলোকে আশ্রয় দিলেন। নীতীন্দ্রনাথের শেষ দিনগুলিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রোগশয্যার পাশে থেকে পরিচর্যা করেছেন সান্ত্বনা দিয়েছেন। অসুখের কঠিন সময়ে লিখেছেন 'অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়' গান আর 'রোগীর শিয়রে রাত্রে ছিনু একা জাগি' কবিতা।

- স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু (১ মার্চ ১৮৭৪ — ২৩ নভেম্বর ১৯০২)

১৯০১ সালে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপনের রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলাইদহ থেকে শান্তিনিকেতনে চলে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের তখন তীব্র আর্থিক অনটন। বিদ্যালয়ের নতুন বাড়ি, হোস্টেল নির্মাণ, আসবাবপত্র, পাঠাগার তৈরি করা, ছেলেদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা, শিক্ষক নিয়োগ নানা কাজে রবীন্দ্রনাথের একেবারে জেরবার অবস্থা। স্বামীর কর্মযজ্ঞে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন স্ত্রী মৃণালিনী দেবী। কাজের বিরাট অংশ তুলে নিলেন নিজের কাঁধে। একে একে সমস্ত গয়না বিক্রি করে দিলেন রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন — প্রকল্পের খরচের জন্য। দুর্বল অপুষ্ট শরীরে এত পরিশ্রম সহ্য হলো না। ১৯০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নতুন বিদ্যালয়ের কাজে রবীন্দ্রনাথ তখন চূড়ান্ত ব্যস্ত, একমুহূর্ত বিশ্রামের অবকাশ নেই। তারই মধ্যে স্ত্রীর চিকিৎসা শুরু হলো সাধারণ অসুখ ভেবে। কিন্তু দিনে দিনে রোগের তীব্রতা বাড়তে থাকায় ২৭ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ মৃণালিণীকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। জোড়াসাঁকোর লালবাড়ির দোতলায় মৃণালিণীর রোগশয্যা। তখনকার নামকরা চিকিৎসকদের আপ্রাণ চেষ্টাতেও তেমন সুফল হলো না। স্ত্রীর সেবাযত্নের সমস্ত ভার রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে তুলে নিলেন। পরে রথীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন — "আমার এখন সন্দেহ হয় তাঁর অ্যাপেণ্ডিসাইটিস হয়েছিল। তখন এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা ছিল না, অপারেশনের প্রণালীও আবিষ্কৃত হয়নি। তখনও কলকাতায় বিদ্যুতের প্রচলন হয় নি।" রবীন্দ্রনাথ হাতপাখা নিয়ে দিনের পর দিন রাতের স্ত্রীকে অবিচলভাবে বাতাস করে তাঁকে একটু আরাম দিতে চেয়েছেন। কিন্তু এত চেষ্টার পরেও ধরে রাখা গেল না। ১৯০২ সালে ২৯ নভেম্বর মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়সে ঊনিশ বসন্তের দাম্পত্যজীবনের ইতি ঘটিয়ে মৃণালিণী অনন্তলোকে পাড়ি দিলেন। রেখে গেলেন পাঁচ ছেলেমেয়ে আর একচল্লিশ বছরের নিঃসঙ্গ কবিকে।

রথীন্দ্রনাথের লেখায় — "বাবা আমাকে মায়ের ঘরে নিয়ে গিয়ে শয্যাপার্শ্বে তাঁর কাছে বসতে বললেন। তখন তাঁর বাক্‌রোধ হয়েছে। আমাকে দেখে চোখ দিয়ে কেবল নীরবে অশ্রুধারা বইতে লাগল। মায়ের সঙ্গে আমার সেই শেষ দেখা। আমাদের ভাইবোনদের সকলকে সে রাত্রে বাবা পুরানো বাড়ির তেতলায় শুতে পাঠিয়ে দিলেন। একটি অনির্দিষ্ট আশঙ্কার মধ্যে আমাদের সারা রাত জেগে কাটল। ভোরবেলায় অন্ধকার থাকতে বারান্দায় গিয়ে লালবাড়ির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলুম। সমস্ত বাড়িটা অন্ধকারে ঢাকা, নিস্তব্ধ, নিঝুম; কোনো সাড়াশব্দ নেই সেখানে। আমরা তখনি বুঝতে পারলুম আমাদের মা আর নেই, তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।" সে রাত্রেও রবীন্দ্রনাথ ঘুমোতে পারেন নি, একাকী নির্জন ছাদে সারারাত পায়চারি করেছেন, অন্তরে বয়ে চলেছে ঝড়। পরদিন স্ত্রীর সদাব্যবহৃত চটিজোড়া রথীন্দ্রনাথকে দিয়ে বললেন — "এটা তোর কাছে রেখে দিস, তোকে দিলুম।" তবে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথের

মনে ও ব্যবহারে যে অস্থিরতা দেখা গিয়েছিল, মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু কবি অনেক শান্ত ভাবে মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর কথায় 'ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়াছেন সেই শোককে তিনি নিষ্ফল করিবেন না — তিনি আমাকে শোকের দ্বারা মঙ্গালের পথে উত্তীর্ণ করিয়া দিবেন।' তাছাড়া নাবালক সন্তানদের লালনপালন, শান্তিনিকেতনের কাজের ব্যস্ততায়, ঋণের বোঝায় তখন তাঁর এক মুহূর্ত অবসর ছিল না। পত্নী বিয়োগের পরে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুচ্ছ আর কিছু গান। তবে কাদম্বরী দেবীর মতো মৃণালিণীর মৃত্যুশোক রবীন্দ্রনাথের জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হয় নি।

- কন্যা রেণুকা দেবীর মৃত্যু (২৩ জানুআরি ১৮৯১ — ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৩)
  মৃণালিনী দেবীর অসুখের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের অক্টোবর মাস থেকেই মেজো মেয়ে রেণুকা আর ছোটো মেয়ে মীরা দুজনে একই সঙ্গো আসুস্থ হয়ে পড়েন। রেণুকা বরাবরই রুগ্ন। প্রথমে অল্প অল্প জ্বর, খুসখুসে কাশি আর সোরথ্রোট দিয়ে শুরু হলেও কিছুদিন পরে তা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌঁছাল। তখন চিকিৎসকের পরামর্শে রবীন্দ্রনাথ ১৯০৩ সালে মার্চ মাসে তাঁকে হাজারিবাগে নিয়ে যান স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায়। কিন্তু অসুখের কোনো উন্নতি না হওয়ায় ঠিক হলো তাঁকে এবার আলমোড়ায় নিয়ে যাওয়া হবে। ততদিনে জানা গিয়েছে রেণুকার অসুখটি কালব্যাধি যক্ষারোগ, যার চিকিৎসা তখন একেবারেই অজানা ছিল। বৈশাখ মাসের ২১ তারিখে (৪ মে ১৯০৩) শান্তিনিকেতন থেকে যাত্রা করে, পথে অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগের পর, আলমোড়া পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন — "মোগলসরাই যখন পৌঁছান গেল ষ্টেশনমাষ্টার বললেন আমাদের গাড়ি মেলে যাইবে না, প্যাসেঞ্জারে জুড়িয়া দিবেন।... যে সময় বেরিলি পৌঁছিবার কথা তাহার বারো ঘন্টা পরে পৌছিলাম। সেখানে একদিনও অপেক্ষা না করিয়া সেইদিনই কাঠগোদামে আসিতে হইল — সেখানে না পাইলাম থাকিবার জায়গা, না পাইলাম আলমোড়া — যাত্রার কুলি — সেই দ্বিপ্রহর রৌদ্রে অনাহারে রেণুকাকে লইয়া এক্কায় চড়িয়া রাণীবাগ নামক এক জায়গায় ডাকবাংলায় গিয়া কোনোমতে অপরাহে আহারাদি করা গেল। যাহা হউক পথের সমস্ত কষ্ট বর্ণনা করিয়া কি হইবে? কোনোপ্রকারে গম্যস্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি — রেণুকার জ্বর বাড়িয়াছে, কিছুদিন বিশ্রামের পর এখানকার জলবায়ুর ফলাফল বুঝা যাইবে।"

আলমোড়ার জল হাওয়ায় প্রথমদিকে কিছুটা আশার আলো দেখা গেলেও অগস্ট মাসে শুরু হলো যমে-মানুষে টানাটানি। আর সময় নষ্ট না করে রবীন্দ্রনাথ মেয়েকে নিয়ে ২৯ অগস্ট কলকাতায় ফিরে আসেন। ফেরবার সময়েও পথের দুর্দশা রবীন্দ্রনাথের পিছু ছাড়ে নি। কলকাতায় রেণুকার অবস্থা দিনদিন অবনতি হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন, আর কোনো আশা নেই, সে একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। ডাক্তারের আনাগোনা বাড়ল, রোগীর গায়ে রোদ লাগাবার জন্য লাল বাড়ির তিন তলায় তৈরি করা হলো কাঁচের ঘর। কিন্তু সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে ১৯০৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর মাত্র এগারো বছরের জীবনে ইতি ঘটিয়ে মরণের ডাকে সাড়া দিয়ে রবীন্দ্রনাথের আদরের রানী চিরবিদায় নিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই মৃত্যুকে অত্যন্ত শান্তভাবে, স্থৈর্যের সঙ্গো মেনে নিয়েছিলেন। রোজকার জীবনে এর কোনো প্রভাব পড়ে নি। মেয়ের মৃত্যুর দিনেও একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার শেষে রমেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যখন রেণুকার অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, কবি শুধু শান্তভাবে বলেছিলেন, 'সে আজই মারা গিয়েছে'।

- পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু (১৫ মে ১৮১৭ — ১৯ জানুআরি ১৯০৫)
  রবীন্দ্রনাথের জীবনে চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথে ভূমিকা অপরিসীম। তিনি তাঁর 'আত্মমগ্ন ভাবুক কণিষ্ঠ পুত্রের মধ্যে বিশেষ এমন কিছু দেখেছিলেন যা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তাই 'নিজের ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে রেখে পুত্রের ব্যক্তিত্বের যথাযথ উন্মেষ ঘটানোর আকাঙ্ক্ষায়' সেই কিশোর বয়সে রবীন্দ্রনাথেকে তাঁর হিমালয় ভ্রমণের সঙ্গী করে নিয়েছিলেন।

মধ্যজীবনের পর থেকেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শরীর একটু একটু করে ভেঙে পড়তে শুরু করেছিল। ১৮৮৫ সালে, ৬৭ বছর বয়সে বোম্বাইয়ের বান্দোরা অঞ্চলের সমুদ্রতীরে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে কিছুদিন বাস করছিলেন। কিন্তু ছয় মাসের মধ্যেই তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রবীন্দ্রনাথ তখন নাসিকে সত্যেন্দ্রনাথের বাসায় কাব্যরচনায় নিমগ্ন। পিতার অসুখের খবর শুনে তড়িঘড়ি চলে এসেছেন বান্দোরায়, আপ্রাণ সেবা করেও মহর্ষিকে সুস্থ করতে না পেরে নিয়ে এলেন তাঁর চুঁচুড়ার বাড়িতে। সেখানে ১৮৮৫ সালের ফেব্রুআরি মাসে আবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে রবীন্দ্রনাথ সমস্ত কাজ ফেলে বারবার চুঁচুড়ায় ছুটে গিয়েছেন অসুস্থ পিতার সেবাশুশ্রূষা

© Santiniketan Sahityapath

করবার জন্য। পিতার এই কঠিন সময়ে রবীন্দ্রনাথের দিনগুলি কেটেছে অবর্ণনীয় মানসিক উদ্বেগে। সকলের মিলিত প্রচেষ্টা ও প্রার্থনায় ঈশ্বর মুখ তুলে চাইলেন, মহর্ষী ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেলেন, মহর্ষি ফিরে এলেন কলকাতায়। কিন্তু ১৯০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে দেবেন্দ্রনাথ আবার ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ৮৯ বছর। নানা শারীরিক সমস্যায় জর্জরিত, কোনো চিকিৎসাতেই আর সাড়া দিলেন না। ১৯ জানুআরি দুপুর ১.৫৫ মিনিটে তিনি পাড়ি দিলেন অনন্তলোকে।

দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর কারণে সে বছরের ৫৭তম মাঘোৎসবের অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বলেছিলেন — "যিনি এই গৃহের স্বামী ছিলেন, তাঁহার মত্যুতে এই গৃহের কর্মপ্রবাহ সহসা স্তব্ধ হইতে পারে, সংসারযাত্রায় সমস্ত রথচক্র সহসা অবরুদ্ধ হইতে পারে, পরিজনবর্গের উৎসাহ উল্লাস সহসা ম্লান হইতে পারে — কিন্তু এই গৃহস্বামী যাঁহাকে তাঁহার চিরজীবনের স্বামী বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার উৎসব তা লেশমাত্র ক্ষুণ্ন হইতে পারে না।"

রবীন্দ্র কাব্যে মৃত্যু দর্শন—

জীবনের প্রথমদিকে শৈশব ও কৈশোরে মা ও কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুতে গভীর শোক অনুভব করেন তিনি। ফলত পরবর্তী জীবনে অসংখ্য প্রিয়জনের বিয়োগ যন্ত্রণা মৃত্যুকে বারবার তাঁর লেখায় ফুটিয়ে তুলতে বাধ্য করে। তাঁর রচনায় মৃত্যু একদিকে যেমন এক নিষ্ঠুর বিভেদক শক্তি, তেমনি অন্যদিকে এটি জীবনকে সম্পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়া এক অনিবার্য ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। অল্প বয়স থেকেই মৃত্যুর কারণে সৃষ্ট শোক ও বিচ্ছেদ তাঁর কবিতায় এসেছে বারবার। 'সোনার তরী' কাব্যের 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় প্রেমের মৃত্যুঘটিত বেদনা প্রকাশ পেয়েছে —

"কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী। চলিতেছি যতদূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্মান্তিক সুর
'যেতে আমি দিব না তোমায়'। ধরণীর
প্রান্ত হতে নীলাভ্রের সর্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে,
'যেতে নাহি দিব। যেতে নাহি দিব।' সবে
কহে 'যেতে নাহি দিব'। তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে 'যেতে নাহি দিব'।"

অসীম প্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে যেমন বিশ্বস্বীকৃতি এনে দিয়েছেন, তেমনি তার চিন্তার স্তরে স্তরে যে মানবকল্যাণের বিচিত্র দিক প্রতিফলিত, রবীন্দ্র-গবেষণায় এসব দিকও উঠে এসেছে। তবে সুদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে রবীন্দ্রনাথকে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত ধারণ-লালন করতে হয়েছে। বালক বয়সে মায়ের মৃত্যু এবং পরবর্তীতে সন্তান ও স্ত্রীর অকাল মৃত্যু এর মধ্যে অন্যতম। মৃত্যুর মতো বেদনাবহ ঘটনা যেখানে সমগ্র মানব সত্তাকে উলট-পালট করে দিতে সক্ষম, সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একান্ত স্বজন হারিয়েও নিজেকে স্থির রেখেছিলেন। তবে কাব্য-সাহিত্যে কবির 'মৃত্যু-দর্শন' নানা অনুষঙ্গে বিকশিত ও সমন্বিত হওয়া থেকে উপলব্ধ হয়, তারও অন্তঃস্থলে প্রচুর ভাঙচুর চলেছে। যতই তিনি বেদনাবহ ঘটনাগুলি সসম্মানে আত্মস্থ করে উপেক্ষা করুন না কেন। নিজের জন্মদিনের আড়ম্বর নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন 'প্রবাসী' পত্রিকায় লেখেন —

"খ্যাতির কলবরমুখর প্রাঙ্গণে
আমার জন্মদিনের যে আসন পাতা রয়েছে,
সেখানে স্থান নিতে আমার মন যায় না।
আজ আমার প্রয়োজন স্তব্ধতায় শান্তিতে।"

© Santiniketan Sahityapath

"মৃত্যু অজ্ঞাত মোর
আজি তার তরে
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে
এত ভালোবাসি
বলে হয়েছে প্রত্যয়
মৃত্যুরে আমি ভালো
বাসিব নিশ্চয়"

রবীন্দ্রনাথ যখন খণ্ড বা বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে মৃত্যুকে দেখেছেন তখন মৃত্যু জীবনের অনিবার্য নিষ্ঠুর শূন্যময় পরিণাম হিসেবে তাঁর কাছে দেখা দিয়েছে। মৃত্যুতে জীবনের চরম অবসান ঘটে বলে মনে হয়েছে। জগৎ ও জীবন তাঁর কাছে অন্ধকার ও বিষাদময় হয়ে উঠেছে। এজন্য কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুশোকে তিনি বিহ্বল হয়েছেন।

আশ্চর্যের বিষয় জীবনের প্রথম শোক যখন তাঁকে গ্রাস করেছিল তখনই সেই মৃত্যুর মাঝেই কোথায় যেন তিনি অস্পষ্ট স্বরে শুনতে পেয়েছিলেন অনন্তের বাণী — "এই দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হইতাম জীবন যে একেবারে অবিচলিত নিশ্চিত নহে এই দুঃখের সংবাদেই মনের ভার লঘু হইয়া গেল।... সংসারের বিশ্বব্যাপী অতি বিপুল ভার জীবন হরণপূরণে আপনাকে আপনি সহজেই নিয়মিত করিয়া চারিদিকে কেবলই প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে সে ভার বদ্ধ হইয়া কাহাকেও কোনোখানে চাপিয়া রাখিয়া দিবে না। একেশ্বর জীবনের দৌরাত্ম্য কাহাকেও বহন করিতে হইবে না, এই কথাটা একটা আশ্চর্য নূতন সত্যের মতো আমি সেদিন যেন প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলাম।" বহুকাল পরে, কবির পঞ্চাশ বছর বয়সে এই পঁচিশ বছরের শোক তাঁর কাছে ফিরে এসেছে শান্তিরূপে। শ্রাবণের মেঘের মতো কালো শোক আশ্বিনের সোনার প্রতিমা হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর নয়নে। 'লিপিকা'র 'প্রথম শোক' তাঁকে বলেছে, "যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েছে শান্তি।" কিন্তু শোককে শান্ত মনে অখণ্ডের পটভূমিকায় গ্রহণ করতে তাঁকে পাড়ি দিতে হয়েছে জীবনের দীর্ঘ পথ। সইতে হয়েছে বহু মৃত্যুর কঠিন থেকে কঠিনতর আঘাত।

জীবনের একটা সময় তাঁর ওপর দিয়ে বয়ে গেছে শোকের ঝড়।১৯০১ সালে তাঁর প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় বলেন্দ্রনাথ ও নীতিন্দ্রনাথের মৃত্যু, ১৯০২ সালে পত্নী মৃণালিনী দেবীর প্রয়াণ, ১৯০৩এ কন্যা রেণুকা, ১৯০৪এ আশ্রমবন্ধু সতীশচন্দ্র রায়ের মৃত্যু, ১৯০৫এ পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের লোকান্তর কবির জীবনে বিশাল শূন্যতার সৃষ্টি করে। বারবার মৃত্যুর আঘাতে কবির অন্তর্জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কবি ক্রমে ক্রমে অন্তর্মুখী হয়ে পড়েন। বহির্জীবনে শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের আর্থিক সংকট, কার্জনী শাসনে বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক উত্তাপ তাঁকে ক্রমাগত পোড়াতে থাকে। বহির্জীবনে এই ঘাত সংঘাত তাঁকে আরো অন্তর্মুখী করে তোলে। নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখার সাধনা কবিকে এমনভাবে পেয়ে বসে যে 'খেয়া'থেকে 'গীতাঞ্জলি' পর্বের কাব্যে একান্ত আপন কথা বলতে শুরু করেন কবি। একথা অপরকে বোঝাবার জন্য নয়, এ কেবল অন্তরে অনুভব করা। কবির এ সময়কার মনের অবস্থা 'খেয়া'কাব্যের 'শেষ খেয়া' কবিতার মধ্যে সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। কবিতাটি কবির অরূপ জগতে প্রবেশের সংকেত নির্দেশ করেছে। তবে মনের এই মানসিক প্রস্তুতি 'নৈবেদ্য'র (১৯০১) যুগেই এসে গিয়েছিল।

পত্নীবিয়োগের দুঃসহ বেদনাকে বুকে নিয়ে যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত মধ্যম কন্যা রেণুকার শুশ্রূষার জন্য কবি তাকে নিয়ে যান আলমোড়া। সেখানে তার রোগশয্যার পাশে বসে 'শিশু'র কবিতাগুলি লেখা হয়। কবি বলেন, "আলমোড়াতে যখন তাকে (মেজ মেয়ে রেণুকা) চেঞ্জে নিয়ে যাই, তখন তার অসুখ খুব বেশি। তাকে খুশি রাখবার জন্যে রোজ রোজ কবিতা লিখে বিছানার পাশে বসে শোনাতুম, যাতে কিছুক্ষণও অন্তত রোগের যন্ত্রণা ভুলে থাকে। এমনি করেই আমার 'শিশু' বইখানা লেখা হয়েছে। ও কবিতাগুলো রানীর অসুখের সময় লিখেছিলুম।" ১৯০৩ সালে কবিকে চিরদিনের জন্য ছেড়ে চলে গেলেন রানী। রানীর চলে যাওয়ার দিন রামেন্দ্রসুন্দর এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে সে খবর না জেনেই। দীর্ঘ আলাপের পর রামেন্দ্রসুন্দর রানীর কথা জানতে চাইলে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আজ সকালে সে মারা গিয়াছে।"

© Santiniketan Sahityapath

পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ চলে গেলেন ১৯০৫ সালে। ১৯০৭ সাল পুজোর ছুটিতে কবির কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ মুঙ্গেরে বন্ধুর বাড়ি গেলেন ছুটি কাটাতে। সেখানে কলেরায় আক্রান্ত হলেন। কবি টেলিগ্রাম পেয়েই সেখানে পৌঁছলেন, কিন্তু শমীন্দ্রকে রক্ষা করা গেল না। মাত্র তেরো বছর বয়সে চলে গেলেন প্রাণপ্রিয় পুত্র শমীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বুক পেতে নিলেন সেই শোক। সহ্য করলেন, "শমী যে রাত্রে চলে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে, পড়ে নি, সমস্তের মধ্যেই সবই রয়ে গেছে। আমিও তার মধ্যে। সমস্তের জন্য আমার কাজও বাকি রইল।" শমীর মৃত্যুতে কবির মনে নিদারুণ আঘাত লাগলেও তার কোনো প্রকাশ দেখা গেল না। দৌহিত্র নীতিন্দ্রনাথ মারা গেলে মেয়ে মীরাকে তিনি একটি চিঠিতে লেখেন — "যে রাত্রে শমী গিয়েছিল সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক, আমার শোক তাকে একটুও পিছনে না টানে।" আঘাতে আঘাতে জর্জরিত রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি'তে বিশ্বদেবতাকে আশ্বস্ত করে বললেন —

"আরো আঘাত সইবে আমারো
আরো কঠিন সুরে জীবন তারে ঝংকারো।।
যে রাগ জাগাও আমার প্রাণে,বাজেনি তা চরম তানে
নিঠুর মূর্ছনায় যে গানে মূর্তি সঞ্চারো।
লাগে না গো কেবল যেন কোমল করুণা,
মৃদু সুরের খেলায় এ প্রাণ ব্যর্থ কোর না
জ্বলে উঠুক সকল হুতাশ, গর্জি উঠুক সকল বাতাস
জাগিয়ে দিয়ে সকল আকাশ পূর্ণতা বিস্তারো।।"

কবির প্রিয় কন্যা মীরার দাম্পত্য ছিল অ-সুখের। মীরা ও নগেন্দ্রনাথের বিবাহ সুখের হয়নি। সেই ব্যথা প্রতিনিয়ত দগ্ধ করেছে কবিকে ভেতরে ভেতরে। তিনি নিজে এই বিবাহ স্থির করায় সারাজীবন মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা পেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন মেয়ের অপঘাতে মৃত্যুও। রথীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে তিনি লেখেন,

"বিয়ের রাত্রে মীরা যখন নাবার ঘরে ঢুকছিল
তখন একটা গোখরো সাপ ফস করে ফণা ধরে উঠেছিল —
আজ আমার মনে হয় সে সাপ যদি তখনই ওকে কাটত
তাহলে ও পরিত্রাণ পেত।"

কবির প্রথমা কন্যা মাধুরীলতা, তাঁর আদরের বেলিও কবির কাছে বেশিদিন থাকলেন না। যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে কবিকে ছেড়ে চলে যান ১৯১৮ সালের ১৬ই মে। এভাবেই আরো আরো আঘাত সহ্য করলেন কবি। বরণ করে নিলেন বিশ্বদেবতার শোকের দুঃখের বীণাটিকে আপন অন্তরে। সেই বীণায় তুললেন তিনি নব জীবনের তান। সেই সুর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে আমাদের অন্তরে ছড়িয়ে পড়লো। আমরা সে পরমানন্দের বাণীতে পেলাম শোক, যন্ত্রণা, অবসাদ থেকে উত্তরণের শক্তি। দুঃখ তাঁর অন্তরে চুপি চুপি আপনার চিরস্থায়ী আসনটি পাতলো, থাকলো পরমেশ্বরের চরণচিহ্ন রূপে একান্তে। কবি জীবনবিমুখ হলেন না। কর্মবিমুখ হলেন না। জগতের আনন্দময় কর্মযজ্ঞে সঁপে দিলেন নিজেকে।

জন্মমৃত্যুর রহস্যের কথা বোঝাতে গিয়ে শেষ বয়সে একদিন তিনি রানী চন্দকে কথায় কথায় বলেন — "জীবন যেমন সত্য, মৃত্যুও ততটাই সত্য। মৃত্যু না থাকলে জীবনের কোনো মূল্যই থাকে না। যেমন বিরহ না থাকলে মিলনের কোনো মানে নেই। তাই শোকটাকে অত বাড়িয়ে দেখা ঠিক নয়। অনেক সময় আমরা চেষ্টা করে আর খুব ঘটা করে শোককে জাগিয়ে রাখি, তা না হলে যেন যাকে হারিয়েছি তার কর্তব্যের ত্রুটি হলোবলে নিজেকে অপরাধী মনে হয়। কিন্তু আমার মতে সেইটাই অপরাধ, কারণ এটা মিথ্যে। জীবনের 'হ্যাঁ 'এর দিক হলো বেঁচে থাকার আনন্দ আর 'না' এর দিক হলো মৃত্যু। তাই মৃত্যুর চেয়ে জীবনের দাবি নিশ্চয়ই বেশি।" এ কথারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই তাঁর 'মৃত্যুঞ্জয়' কবিতায়,

© Santiniketan Sahityapath

"দূর হতে ভেবেছিনু মনে
দুর্জয় নির্দয় তুমি, কাঁপে পৃথ্বী তোমার শাসনে...
তোমার আঘাত সঙ্গে নেমে এলে তুমি
যেথা মোর আপনার ভূমি
ছোটো হয়ে গেছ আজ।
আমার টুটিল সব লাজ
যত বড়ো হও,
তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও।
আমি মৃত্যু চেয়ে এই শেষ কথা বলে
যাব আমি চলে।"

এই বিশ্বাসে স্থিত হতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর গীতবিতান ভরে উঠেছিল জীবন আনন্দের গানে। তিনি মৃত্যুর কাছে জীবনের পরাজয় স্বীকার করতেন না। আর সেই অস্বীকারের প্রকাশ কেবল তাঁর কবিতায়, গানে, গল্পে নয় তাঁর জীবনচর্যার প্রতি দিনের আলাপচারিতায়। জীবনের শেষ মুহূর্তে যখন তিনি তীব্র রোগাক্রান্ত এক মুহূর্তের জন্যও হার মানেন নি অসুখের কাছে, ক্লান্তির কাছে, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে করেছেন সুচিন্তিত মন্তব্য। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর কলম সচল থেকেছে। চরম অসুস্থতার মধ্যেও খবর নিয়েছেন তাঁর পোষ্যদের ঠিকমত খাবার দেওয়া হচ্ছে কিনা। দারোয়ানের বাড়ির অসুস্থ মানুষটি ভালো আছে কিনা এমন সব অতি সাধারণ বিষয়েও।

মৃত্যুর সঙ্গে কেবল পরোক্ষ নয় প্রত্যক্ষ পরিচয়ও ঘটেছিল তাঁর। ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কবি হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। সৌভাগ্যবশত অল্পসময়ের মধ্যেই তাঁর সংজ্ঞা ফিরে আসে। কিন্তু —

"এই অকস্মাৎ হৃত চৈতন্যলোক হইতে প্রত্যাবর্তনকে
কবি নবজীবন লাভের সহিত তুলনা করিয়াছেন;
মনে হইতেছে অধ্যাত্মলোকের নবতম রহস্য উদ্ঘাটিত হইতেছে।"

মৃত্যুর প্রায় সাক্ষাৎ দর্শনের অভিজ্ঞতা সত্যের জ্যোতির স্পর্শে ও এক অশরীরী অনুভূতির রসে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই জন্য তাঁর প্রান্তিকের মৃত্যুভাবনা তাঁর আগের মৃত্যু বিষয়ক চিন্তা থেকে একেবারেই আলাদা। কবির দৃষ্টি এখানে স্পষ্টতই ঔপনিষদিক আত্মোপলব্ধির গভীরে নিমগ্ন। জীবন রঙ্গমঞ্চে এতদিন যে সাজে তিনি নিজের পরিচয় রচনা করেছেন, মৃত্যুদূতের স্পর্শে আজ তা তাঁর কাছে নিরর্থক মনে হয়েছে। বাইরের বর্ণ প্রসাধন মুছে গেছে, নিজের নিগূঢ় পূর্ণতা উপলব্ধির জন্য কবির আত্মা উন্মুখ হয়েছে,

"দেখিলাম অবসন্ন গোধূলি বেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি..
অন্তহীন তমিস্রায়। নক্ষত্রবেদীর তলে আমি
একা স্তব্ধ দাঁড়াইয়া, ঊর্ধ্বে চেয়ে কহি জোড় হাতে —
হে নূতন সংবরণ করিয়াছে তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার আমার মাঝে এক।"

কবিতাটিতে কবি "নিজেকে যেন দুটি পৃথক সত্তায় ভাগ করে পাশাপাশি রেখেছেন। দেহ আর চৈতন্য।... চৈতন্যরূপে জ্যোতিস্বরূপের সাক্ষাৎ প্রাপ্তিই এখন কাম্য। মৃত্যু এখন সেই জ্যোতির্গমনের অপেক্ষায় রয়েছেন।" (উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, 'রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির উজ্জ্বল স্রোতে')।

 © Santiniketan Sahityapath

এখানেও এক জ্যোতির্ময় সত্তার প্রকাশই আমরা দেখি। তিনি যেন সময় হলেই দুয়ার ভেঙে এসে আমাদের ঠিকই নিয়ে যাবেন। সেই আলোরই জয়গান গেয়েছেন কবি অর্ধচেতন অবস্থাতেও। যা আমাদের মৃত্যুর দুয়ারটুকু পার হয়ে যেতে সংশয় কাটিয়ে দেয়। মনে সাহস দেয়, আমরাও তাঁর সঙ্গে বলতে পারি —

"দুদিক দিয়ে ঘেরা ঘরে তাইতে যদি এতই ধরে,
চিরদিনের আবাসখানা সেই কি শূন্যময়শূন্য
জয় অজানার জয়।"

রবীন্দ্র দর্শনে ঔপনিষদিক মৃত্যু চেতনা —

প্রথমেই উপনিষদ কী তা জানা প্রয়োজন। বেদ হলো সনাতন বা হিন্দুধর্মের প্রাচীনতম এবং প্রধান পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, যা মূল জ্ঞান বা ঐশ্বরিক জ্ঞানের আধার। বেদ চারটি ভাগে বিভক্ত। যথা, ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। বেদে মোট মন্ত্র সংখ্যা ২০৩৭৯টি। প্রত্যেকটি বেদ আবার চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত: সংহিতা (মন্ত্র ও আশীর্বচন), ব্রাহ্মণ (ধর্মীয় আচার, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও যজ্ঞাদির উপর টীকা), আরণ্যক (ধর্মীয় আচার, ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম, যজ্ঞ ও প্রতীকী যজ্ঞ) ও উপনিষদ্ (ধ্যান, দর্শন ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সংক্রান্ত আলোচনা)। এরপর পুরাণ, ভগবদ্গীতা ইত্যাদির মতো আরো অনেক ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। যদিও বেদে মূলত দেবতাদের কাছে প্রার্থনা এবং আচার — অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, বেদের শেষ অংশগুলিতে জীবন নীতি রয়েছে। বেদের এই অংশগুলিকে বেদান্ত (বেদের শেষ অংশ) বলা হয়। উপনিষদগুলি বেদান্ত থেকে এসেছে। উপনিষদগুলিকে অনেক প্রাচীন বলা হয়, ৪০০০ বা ৫০০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে নির্মিত হয়েছিল। উপনিষদের মূল ধারণা হলো ব্রহ্ম, যা মহাবিশ্বের সর্বোচ্চ শক্তি এবং মানুষের সঙ্গে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত। তাই উপনিষদকে বলা হয় 'ব্রহ্ম-বিদ্যা', যা ব্রহ্মের জ্ঞান এবং পরমাত্মার ঐক্যের উপলব্ধি ঘটায়।

উপনিষদের সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা মনে করেন —

"এই জগৎ সেই মৃত্যুহীন শাশ্বত সত্তার আনন্দ সম্মিলনের মহাপ্রকাশ।
বিশ্বসৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষহীন বলে যা কিছু বিরাজিত আছে,
তাদের সবই সেই চিরসুন্দর, চিরশুদ্ধ অমরনাথের আনন্দময় অভিব্যক্তি।
বিশ্বের সব সৌন্দর্য, পার্থিব জগতের সঞ্চিত সমস্ত সুধা তার থেকে সৃষ্ট বলেই অবিনাশী।
অনাদিকাল ধরে নানা রূপে বিকশিত। জীবনপ্রবাহ তাই মৃত্যুহীন।
হে অমৃতের অমর সন্তান, এই পরম সত্য জ্ঞাত হয়ে অমৃততত্ত্ব লাভ করো।"

রবীন্দ্রনাথ জীবন এবং বিশ্বসৃষ্টির সুগভীর এসব তাত্ত্বিক দর্শন পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং তা অনন্য সাধারণ শিল্পময়তায়, অতীন্দ্রিয় সত্তার প্রগাঢ় রহস্যময়তায় চিত্রায়িত করেছেন। মৃত্যুচিন্তার ভেতর থেকেও মৃত্যুর নান্দনিক দিকটির উন্মোচন ঘটিয়েছেন তিনি। উপনিষদ অনুসারে, মৃত্যু কেবল একটি শারীরিক সমাপ্তি নয়, বরং আত্মা ও ব্রহ্মের (পরম সত্য) সম্পর্ককে বোঝার একটি পথ। উপনিষদিক চিন্তায় মৃত্যুকে জীবনচক্রের একটি অংশ হিসেবে দেখা হয়, যেখানে আত্মা শরীর ত্যাগ করে ব্রহ্ম বা পরম সত্যের সঙ্গে মিলিত হয়। মৃত্যুকে ভয় বা দুঃখের কারণ হিসেবে না দেখে, একে জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি এবং পরম শান্তি লাভের একটি পথ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মৃত্যুর সময় ব্যক্তির শেষ চিন্তাটিই তার ভবিষ্যৎ যাত্রার দিক নির্ধারণ করে এবং সেই অনুযায়ী আত্মা পরবর্তী জগতে চালিত হয়। বিবেকচূড়ামণি থেকে শঙ্করের সবচেয়ে বিখ্যাত উক্তি —

"ব্রহ্ম সত্যম জগত মিথ্য, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"
[আদি শঙ্করাচার্যের ব্রহ্মজ্ঞানাবলীমালা]

অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ অবাস্তব, এবং ব্রহ্ম এবং আত্মার মধ্যে, অর্থাৎ ব্যক্তিগত সত্ত্বার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উপনিষদের অন্যতম প্রধান বাণী হলো, ব্রহ্ম বা পরম সত্তা এবং আত্মার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই —

"প্রজ্ঞানম ব্রহ্ম" [ঐতরেয় উপনিষদ]

© Santiniketan Sahityapath

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ঔপনিষদিক ভাবনার একান্ত বরপুত্র। দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়, তাঁর সব চিন্তার মাঝে লুকিয়ে আছে উপনিষদিক দর্শনের মর্মবাণী —

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।।"[ঈশা উপনিষদ]

এই শ্লোকটির অর্থ, এই জগতের সকল বস্তুই ঈশ (ঈশ্বর) দ্বারা আবৃত। যেগুলি এই জগতে আছে, সেগুলিকে ত্যাগ করে উপভোগ করো; কোনো সজীব বা নির্জীব বস্তুর প্রতি লোভ করো না। এই গতিশীল বিশ্বে যাহা কিছু চলমান বস্তু আছে তাহা ঈশ্বরের বাসের নিমিত্ত মনে করিবে। কবিতা, গদ্য, প্রবন্ধ এবং গানের ভেতর প্রকাশিত হয়েছে এই দর্শনের অন্তর্গূঢ় রহস্য। অর্থাৎ চিন্তার সব অংশের মাঝে তিনি ছিলেন ঋজু, যার মর্মার্থ গিয়ে পৌঁছেছে বেদান্তের মর্মমূলে। মৃত্যুকে তিনি আলিঙ্গান করেছেন একান্তে, গ্রহণ করেছেন বন্ধুরূপে, ভেবেছেন একান্ত সখা ও প্রেমিক হিসেবে। আবার কোনো সময় মৃত্যুকে বলেছেন অতি নিচ, অনুদার, সর্বগ্রাসী এবং স্বার্থপর। তবে গুরুত্বপূর্ণ হলো তাঁর জীবন-শেষের উপলব্ধি যা দার্শনিক সংশয়ী চিন্তায় পরিপূর্ণ, অনেকটা অস্পষ্ট, দ্বিধাযুক্ত এবং পরিশ্রান্ত পথিকের ন্যায় বেশখানিকটা উদাসী। এখানে তাঁর চিন্তার একটি রেখাচিত্র তুলে ধরবো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উনিশ শতকের অন্যতম প্রভাবশালী কবি, দার্শনিক, গীতিকার ও সুরকার। তাঁর লেখনীতে ব্যাপকভাবে উপনিষদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। উপনিষদের প্রতিটি শ্লোক বিশ্ব ও মানব অস্তিত্বের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে উপস্থাপন করে, যা দর্শনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। উপনিষদ পৃথিবীর প্রাচীনতম নিদর্শন যা বেদান্ত দর্শনের উৎস এবং ভারতীয় দর্শনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সুসংগত দার্শনিক ব্যবস্থা বলে গৃহীত। এগুলি খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে লেখা হয়েছিল এবং উপনিষদগুলির অনেক দার্শনিক ধারণা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখনীগুলিকে প্রবাহিত করেছিল নানাভাবে। যদিও উপনিষদগুলি ২০০০ বছরেরও বেশি আগে রচিত হয়েছিল, কিন্তু উপনিষদের শ্লোকগুলি আজও ততটা সমসাময়িক এবং জীবন্ত, যা ভারতীয় চিন্তাধারা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। যা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায় চিন্তায় চেতনা এবং দৈনন্দিন জীবনের একটি বড় অংশ।

মৃত্যুকে জীবনের সীমাবদ্ধতা ও বোঝা থেকে মুক্তি এবং এক পরম স্বস্তির স্থান হিসেবে দেখা হয় উপনিষদে। এটি জীবনের একটি স্বাভাবিক এবং অনিবার্য পরিণতি, যা মহাজাগতিক নিয়মের অংশ। উপনিষদে মৃত্যুচেতনা বলতে মূলত মৃত্যুর পরেও কী ঘটে এবং আত্মজ্ঞান বা মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যা আমরা উপনিষদের এই শ্লোকটি থেকে জানতে পারি —

"অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোমা অমৃতং গময়,
ওম শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"[বৃহদারণ্যক উপনিষদ]

এর অর্থ আমাকে নিয়ে চলো অসত্য থেকে সত্যি,অন্ধকার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে অমৃতে। এই অনিত্য মৃত্যুময় জগৎ থেকে আমাকে শাশ্বত আনন্দের জগতে নিয়ে চলো। তোমার করুণার দীপ্তিতে আমার অন্তরাত্মা সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক। আমাকে জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার করো এবং পুনর্জন্মের মূল যে কামনা বাসনা তার বিনাশ ঘটাও। এটি একটি শান্তির মন্ত্র যা জ্ঞান, সত্য ও শাশ্বত জীবনের জন্য প্রার্থনা করি। ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথের দর্শনে উপনিষদ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে, যেখানে তিনি জীবন ও মৃত্যুর এক গভীর সংযোগ খুঁজে পেয়েছেন —

"কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো!
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো।
রয়েছে দীপ না আছে শিখা,
এই কি ভালে ছিল রে লিখা —
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো।
বিরহানলে প্রদীপখানি জ্বালো।" [গীতাঞ্জলি, বোলপুর আষাঢ় ১৩১৬]

© Santiniketan Sahityapath

এখানে রবীন্দ্রনাথ তার জীবন বোধে মৃত চিন্তাকে এক নতুন দার্শনিক মাত্রা দিয়েছেন। যেখানে মৃত্যু নিজেকে একটি পরিসমাপ্তি নয়, বরং এক নতুন ও অম্লান স্বত্তার দিকে যাত্রার সূচনা করে রবীন্দ্রনাথের কাছে জীবন ও মৃত্যু ছিল অবিচ্ছেদ্য। তিনি জীবনকে ভালোবাসতেন বলেই মৃত্যুর স্বরূপ অনুসন্ধানে আগ্রহী ছিলেন এবং উপনিষদের প্রভাবে এই অনুসন্ধান আরো গভীর রূপ ধারণ করে।

উপনিষদের ব্যাপকতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে সর্বত্র, কী কবিতায় কিংবা গল্পে আবারো গানের ছত্রে ছত্রে দুরন্ত বহতা নদীর মতো প্রবাহমান। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলতে পারি —

"জীবনে যত পূজা হলো না সারা,
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা, জানি।"
[গীতাঞ্জলি ২৩ শ্রাবণ, ১৩১৭]

এ প্রসঙ্গো রবীন্দ্রনাথের আরো একটি গান উল্লেখ করা যেতে পারে —

"আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো —
নিশিদিন আলোক-শিখা জ্বলুক গানে॥"
[গীতাঞ্জলি ১১ ভাদ্র, ১৩২১]

এটি উপনিষদিক ধারণাকে প্রতিফলিত করে যা শাশ্বত, একমাত্র আশ্রয়। উপনিষদের ভাবনা অনুসারী জগতের অনু-পরামানুর মধ্যেই সেই পূর্ণ ব্রহ্মের বাস। যখন জীব অনুভব করবে কারো সঙ্গো ভেদ নেই একটি তৃণের জীবনের যা মূল্য আমার জীবনের মূল্য ঠিক তাই তখন জীবনের সকল হিংসা দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে উঠে সে উপলব্ধি করবে—

"যস্তু সর্বাণী ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানম্ ততো ন বিজুগুপসতে।"
[ঈশোপনিষদ্ শ্লোক ৬]

অর্থাৎ যখন জীব সকলের মধ্যে নিজেকে অনুভব করবে এবং সকল জীবকে নিজের মধ্যে অনুভব করবে। তখন উপনিষদের এই আধ্যাত্মিক ভাবনা ব্যবহারিক জীবনে সাধনায় রূপান্তরিত হয়ে উঠবে।

উপনিষদের আরেকটি চরম সত্য দার্শনিক ধারণা 'আত্মা'র দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিল যা একজন ব্যক্তির অন্তর্নিহিত আত্মা। রবি ঠাকুর বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ তাদের অভ্যন্তরের সঙ্গো সংযোগ করতে পারে এবং এই সংযোগ শান্তি ও সুখ আনতে পারে। তিনি এই ধারণাটিকে তার লেখায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তার অনেক কাজই সেই অন্তর্নিহিত চিন্তা ও অনুভূতির মধ্যে দিয়ে সম্পর্ককে তৈরি করেছে। উপনিষদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শিখিয়েছিল যে মহাবিশ্বের সমস্ত জিনিস পরস্পর সংযুক্ত এবং আত্মা চিরন্তন। এই দর্শনটি তার লেখার উপর প্রভাব ফেলেছিল। তেমনি জীবন সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজতে গিয়ে অনেক সময় জীবনের মূল্য হারিয়ে যায়। তখন দূর থেকে মহাসাগরের মতো মৃত্যু হাতছানি দেয় —

"ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা"
[গীতাঞ্জলি ২৬ আষাঢ় ১৩১৭]

সমগ্র উপনিষদের মূল তত্ত্বই হলো আত্মা ও ব্রহ্ম, আর এই আত্মা ও ব্রহ্মের একাত্ম সাধন। এই সামঞ্জস্যকে ব্যাখ্যা করার জন্য উপনিষদের ঋষিরা বৈচিত্র্যময় জগতের মধ্যে এক মূল সত্তাকে তথা ব্রহ্ম কে কল্পনা করেন। এইসব কিছু জন্ম হয়েছে স্থিতি এবং লয়ের মধ্য দিয়ে। উপনিষদের বিভিন্ন বাণীতে একথা বারবার বলা হয়েছে — "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি শান্ত উপাসীত।" [ছান্দোগ্য

© Santiniketan Sahityapath

উপনিষদ(৩/১৪)শ্লোক সংখ্যা] এর মূল ভাব হলো, যা কিছু আমরা দেখি — বস্তু বা চেতন — সবই ব্রহ্মের অংশ। ব্রহ্মই সবকিছুর জন্ম, স্থিতি ও বিলয়ের কারণ। উপনিষদগুলির সমস্ত কিছুর ঐক্য এবং ঐশ্বরিক একাত্ব রবি ঠাকুরের লেখায় প্রতিধ্বনিত হয় অনেক কবিতার মধ্যেও। তার মৃত্যুচেতনার আভাস পাওয়া যায় তেমনি একটি কবিতা হলো —

"মরণ রে, তুঁহু মম শ্যামসমান।
মেঘবরণ তুঝ, মেঘজটাজূট,
রক্তকমলকর, রক্ত-অধরপুট,
তাপবিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু-অমৃত করে দান॥"
[ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী 'মরণ' কবিতা ১২৮৮ বঙ্গাব্দ]

মরণ শ্যামের মত উদার, প্রেমিকের মতো বন্ধু যিনি বিরহাতুর রাধার পথ প্রদর্শক এবং ক্ষুব্ধ, ঝঞ্ঝাপূর্ণ বিজন পথে অভিসারের প্রেমিকাকে প্রণয়ক্ষণের সাহস সঞ্চারক। এই কবিতার আলোকে সহজে অনুমান করা যায় রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচিন্তায় নান্দনিকতার সফল উপস্থিতি আছে। তবে তাঁর কাব্য-সাহিত্যে কবির 'মৃত্যু-দর্শন' নানা অনুষঙ্গে বিকশিত ও সমন্বিত হয়েছে।

রবি ঠাকুর বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ একটি বৃহত্তর ও বিশ্বের শুধুমাত্র টুকরো অংশ এবং আমরা এই বৃহৎ মহাবিশ্বকে সঙ্গে করেই প্রকৃত সুখ খুঁজে পেতে পারি। এই দর্শনটি তার লেখায় প্রতিফলিত হয় বারবার যা প্রায়শই পাঠকদের বইয়ের বাইরে চিন্তা করার এবং পৃথিবীতে বিদ্যমান সৌন্দর্য দেখতে আহ্বান জানায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও উপনিষদের সমস্ত জীবনের ঐক্য, বিশ্বাস দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তিনি প্রায়শই মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে আধ্যাত্মিক সংযোগ সম্পর্কে লিখতেন। তিনি উপনিষদের নীতিগুলি ও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন যা পরবর্তী প্রজন্মের বাঙালি কবি ও বুদ্ধিজীবীদের লেখার ওপর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল। আধ্যাত্মিক ও মননশীল জীবন ধারাকে উন্নত করার জন্য যেমন তিনি অনুপ্রেরণা নিয়েছিলেন। তেমনি জীবনের মৃত্যু চেতনা নিয়েই অনেক কবিতা, গান ও প্রবন্ধ লিখেছেন। ঔপনিষদিক মৃত্যুচেতনার রবীন্দ্র দর্শনে মৃত্যুচেতনার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এই উপলব্ধি জ্ঞানের সর্বোচ্চ রূপ এবং এটি সমস্ত জ্ঞানের উৎস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে উপনিষদ ছিল তার সারা জীবনের অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনার উৎস। রবীন্দ্রনাথের মতে, জীবন ও মৃত্যু একই মুদ্রার দুই পিঠ। মৃত্যু কেবল জীবনের শেষ নয়, এটি এক নতুন জীবন বা 'অমরত্বের' পথে যাত্রা শুরু। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জীবনে উপনিষদের এই মৃত্যুর ধারণাকে গ্রহণ করেছেন এবং তা তাঁর সাহিত্য ও দর্শনকে গভীরতা দিয়েছে। তিনি মৃত্যুকে একটি ভয়ংকর ঘটনা হিসেবে না দেখে, জীবনের একটি অংশ হিসেবে এবং চিরন্তন সত্তার সঙ্গে পুনরায় সংযোগ স্থাপনের একটি উপায় হিসেবে দেখিয়েছেন।

উপসংহার —

রবীন্দ্রনাথ জীবন যাপনের অতলস্পর্শী হৃদয়মুখরতার গাম্ভীর্য থেকে খুঁজে এনেছেন মহিমান্বিত নান্দনিকতা। আবার সেই নান্দনিকতার কোলেই তিনি বস্তুত একা হয়েছেন, প্রাণময়ী উন্নতায় মেলে ধরেছেন জীবনের সহস্ররঙ। তাই রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দর্শন' এর মতো তার 'মৃত্যু-দর্শন'ও গুরুত্বপূর্ণ। বোধ করি, জীবনের প্রতিটি মাধুর্যমণ্ডিত মুহূর্তেই তিনি পরম মমতায় মৃত্যুর অনিবার্য শূন্যতাকে উপলব্ধি করেছিলেন; তাই ছিন্নপত্রাবলীতে তিনি লিখেছেন, "ইচ্ছে করে জীবনের প্রত্যেক সূর্যোদয়কে সজ্ঞানভাবে অভিবাদন করি এবং প্রত্যেক সূর্যাস্তকে পরিচিত বন্ধুর মতো বিদায় দিই।" রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি মানবকল্যাণে নিবেদিত ছিলেন বলেই হয়তো স্বজন বিয়োগ বেদনা বা মৃত্যুবেদনা থেকে উত্থিত জীবনবিমুখতা তার কাছে হয়তো স্বার্থমগ্নতারই এক রূপ। তাই তিনি বলেন —

"মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ,
তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই।"

কিংবা,

"তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই —
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।"

© Santiniketan Sahityapath

প্রিয়জনদের নানারকম দুঃখ-সওয়া এবং দুঃখ-দেওয়া অকালমৃত্যুগুলি প্রত্যেকটিই একটিমাত্র প্রশ্ন করে বসে আছে রবীন্দ্রনাথের মনে — মানুষের জীবনে দুঃখের ভূমিকা কি? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই তিনি দুঃখকে বুঝতে সক্ষম হন। যে কারণে কবির ভাবনায় মৃত্যু কখনো প্রণয়ী, বাউল, কখনো বা বালিকা বধূর বর বেশে, সখা সেজে বন্ধুরূপে, অন্ধকারের ধ্যাননিমগ্ন ভাষার মতো অবগুণ্ঠনের আবরণ পরে, অরুণবহ্নির রুদ্র সাজে, জীবন রথের সারথি হয়ে, ললিত লোভন মোহন রূপে কিংবা জ্যোতির্ময়ের পরশমণি হয়ে ধরা দিয়েছে। মৃত্যুর সৌন্দর্য আস্বাদন করে তিনি সেই পরম উপলব্ধির অমৃতধারা ছড়িয়ে দিয়েছেন কবিতা ও গানে, সাহিত্যের নানা শাখায়। প্রশ্ন জাগে, মৃত্যু যদি সবার জীবনে বিনাশসাধনই ঘটাবে, তাহলে জীবন থেকে জীবনান্তরে এই যে অশেষভাবে পথ চলার সহস্র স্মৃতির আনাগোনা, সেটা কেমন করে সম্ভব? তাই বিনাশসাধন নয়, নিরন্তর চলার জন্যই মৃত্যুর স্পর্শলাভে দেহের খোলস বদলে যায় বারংবার। কারণ এমন বদলেই সম্ভব হয়, নানা রূপ পরিগ্রহের ভেতর দিয়ে বিবিধ বৈচিত্র্যের আস্বাদন — রবীন্দ্রনাথে যার সার্থক উপস্থিতি। মানুষের ভালবাসার অকৃপণ উৎস কবিকে ভালোবাসার অপরাজেয় শক্তি যুগিয়েছে। বিদায় তাঁকে নিতেই হবে এ সত্য জেনেও তিনি ভালোবাসার কাছে দাঁড়িয়ে লিখেছেন —

“এ বিশ্বেরে ভালোবাসিয়াছি।
এ ভালবাসাই সত্য এ জন্মের দান।
বিদায় নেবার কালে
এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুরে করিবে অস্বীকার।”

কবির ভাবনা — “জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তার পরিচয় পেতে হবে। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায়নি। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দি করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়, সে জীবন।” (ফাল্গুনী, ১৩২২) রবীন্দ্রনাথ মূলত জীবন অনুসন্ধানের দিকেই গুরুত্বারোপ করেছেন। আর তাই জীবন-মৃত্যুর নিঃশব্দ প্রণয়খেলা কবির কাছে নবজীবন, নবযৌবন লাভের আহ্বান নিয়ে এসেছে। এসেছে নান্দনিক বোধের উৎস হয়ে।

আকর গ্রন্থ:

১। ‘উপনিষদ ১ম খণ্ড’, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ
২। ‘উপনিষদ সমগ্র’, শ্রী মধুসূদন
৩। ‘বৃহদারণ্যক উপনিষদ’, শ্রীমহেশচন্দ্র বেদান্তরত্ন
৪। ‘ঈশোপনিষদ্’, স্বামী ভূতেশানন্দ
৫। ‘গীতাঞ্জলি’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬। জীবনস্মৃতি’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহায়ক গ্রন্থ:

১। প্রমথনাথ বিশী ‘রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ’
২। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য,‘রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা’
৩। শীতল চৌধুরী, ‘রবীন্দ্র কবিতা অধ্যায়ন’
৪। নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়,‘রবীন্দ্র চেতনায় মৃত্যু’
৫। দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়, ‘রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচেতনা’
৬। অসিতকুমার মিশ্র, ‘দর্পণে রবীন্দ্র কবিতা’

—